সঞ্চার

শরদিন্দু কর

ম্যানেজারবাবু, ও ম্যানেজার বাবু।

সকালবেলা এই ডাকাডাকিতে বেশ বিরক্ত হলাম। রাস্তার দিকের বারান্দা গ্রিল দিয়ে ঢাকা। মনে হল রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ ডাকছে। মুখে বিরক্তি নিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি চাই? লোকটি হাত জোড় করে বলল, নমস্কার। আপনি নতুন এসেছেন তাই একটু পরিচয় করতে এলাম।

ওর পোষাক ও চেহারা দেখে আমার পরিচয় করার একটুকুও ইচ্ছে হল না। ময়লা ধুতি, কমদামী হাফ শার্ট। শার্টের বুক পকেট ফুলে রয়েছে নানা কাগজপত্রে। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। মাথায় বড় বড় চুল ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। কাঁচা-পাকা গোঁফ। গায়ের রঙ মাঝামাঝি।

আমার ইচ্ছা না থাকলেও লোকটির উৎসাহ কম ছিল না। যেন আমি শুনতে চেয়েছি সেই রকম উচ্ছসিত হয়ে বলল, এখানকার কোর্টে আমার কেস চলছে। আর কদিন পরেই ডিক্রি হবে। তখন বিপুল সম্পত্তি আর মোটা টাকার চেক্ আসবে। আপনাদের ব্যাঙ্কে সেই চেক্ জমা দেব। তখন আপনার কাছে ঘন ঘন আসতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার তো!

একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে?

বুঝলাম সকালটি মাটি হবে। এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম, আমি খুব ব্যস্ত, আপনি অফিসে এসে দেখা করবেন।

লোকটি মাথা দুলিয়ে বলল, ঠিক আছে আমি এখন আসি। নমস্কার।

আমি ঘরে ঢুকতে যাব, সে যেতে যেতে থেমে গিয়ে আবার একটু কাছে এসে বলল, আপনি ‘ঝিন্দের বন্দী’ পড়েছেন? সেই যে সিনেমা হয়েছিল।

চুপ করে রইলাম।

আমি হলাম এখানকার আসল রাজা। আমার নাম ঠাকুর হরেন্দ্র কৃষ্ণ।

লোকটি চলে যেতে পল্লবী ঘরে ডেকে আমাকে বলল, ভদ্রলোক সকালবেলা চা খেতে চেয়েছিল।

এক কাপ চা দিলে কি ক্ষতি হত?

পল্লবী খুব সরল।

বললাম-- তুমি এখনও মানুষ চিনতে পার না।

অফিসের সহকর্মী শুভেন্দু সেন শুনেই বলল, আপনি স্যার ওর পাল্লায় পড়েছেন মাথা চিবিয়ে খাবে। ওর নাম হরেন ঠাকুর।

জানতে চাইলাম--ব্যাপারটা কী?

শুভেন্দু বলল, তাহলে একটু ইতিহাস শোনাই। আমাদের শহরটি একসময় ছিল ‘মল্লরাজাদের’। এই যে সুন্দ্র টেরাকোটা মন্দির, পাথরের দূর্গ, রাজবাড়ি, দরবার এই সব রাজারা তৈরী করেছিল--

প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে। শুনেছি রাজবংশের আর কেউ বেঁচে নেই। রাজবাড়ি, দরবার সব ভেঙ্গে পড়েছে। মন্দিরগুলি পুরাকীর্তি হিসাবে সরকার দেখাশোনা করে। হরেন ঠাকুরের ধারণা এই রাজবংশের সে শেষ উত্তরাধিকারী। তাই ওর রাজ্য ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্যে সরকারের বিদ্ধে মামলা করেছে। মামলা আদৌ ও করেনি পুরো ব্যাপ

ারটাই ওর কল্পনা। ও এই কল্পনার মধ্যে রয়েছে একদিন সবকিছু আবার ফিরে পাবে। এই সব কথা যখন সকলকে বলে বেড়ায়, লোকে ওর খুব পিছনে লাগে। হরেন ঠাকুর মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করবে।
বাড়ীতে ফিরে পল্লবীকে সব কিছু খুলে জানালাম। বললাম, সাবধানে থেক। আমি যখন বাড়ীতে থাকব না তখন এলে লোকটাকে একেবারেই পাত্তা দেবে না। মুশকিল হল পল্লবী এই সব কথা মোটেই বুঝতে পারে না।
আমি যখন অফিসে ছিলাম সেই সময় একদিন হরেন ঠাকুর বাড়িতে এসেছিল। ঘরের মধ্যে বসে চা-টা খেয়ে গেছে। পল্লবী ওকে সুজির হালুয়া, নিমকি দিয়ে চা খাইয়েছিল। যাবার সময় রাজা নাকি বলে গেছে, এরকম আদর-আপ্যায়ণে ও খুব খুশী। পল্লবীকে ও একদিন গজমোতির হার এনে দেবে।
অফিসে এইসব নিয়ে দাণ হাসাহাসি হল, শুভেন্দু বলল, গজমোতির হার নিশ্চয় দেখাবেন স্যার।
কম্‌সে-কম্‌ চোখে দেখে নেব।
মাঝে মাঝে শুভেন্দু বলে, কি হল স্যার, গজমোতির হার পেয়েছেন?
বুঝলাম এইসব কথা বলে বিপদ করেছি। তবে ব্যাপারটা আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম।
এক ছুটির সকালে ঘুম থেকে উঠেছি।
দরজা খুলে দেখি গ্রিলের ওপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হরেন ঠাকুর।
সেই এক বেশ, এক চেহারা। মুখে একটু হাসি। দেখা হওয়ার সাথে সাথে নমস্কার জানিয়ে বলল,
আজ আপনাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলিনি, ছুটির দিন তো--জানি একটু দেরী করে উঠবেন।
বললাম, কতক্ষণ এসেছেন?
--তা ঘন্টাখানেক হবে।
একজন লোক বাড়ির সামনে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেও খারাপ লাগল, নরম স্বরে বললাম,
--কি, কিছু দরকার আছে?
সেই সময় পল্লবী এসে দাঁড়াল। ওকে দেখে হরেন ঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
পল্লবীর দিকে চোখ তুলে বলল, আজ ওনাকে দরকার। সেদিন বলেছিলাম না গজমোতির হার এনে দেব। এই দেখুন।
দুটো হাত তুলে ধরল। হাতের মুঠোয় সবুজ পাতায় মনে হল কিছু মোড়া রয়েছে। আমার হাতে সেটি তুলে দিয়ে বলল, খুলে দেখুন।
কলাপাতার মোড়কটি খুলে দেখি তার মধ্যে বেগুনি আভা মাখানো সাদা রঙের থোকা থোকা আকন্দ ফুলের মালা।
আমি কিছু বলার আগেই হরেন ঠাকুর বলল, পছন্দ হয়েছে? আমি ভোরবেলায় তুলে এনেছিলাম।
দেরি হলে শুকিয়ে যাবে তাই সকাল সকাল আপনাদের এখানে এসেছি।
ওকে ঘরের মধ্যে ডেকে বসানো উচিত কিনা বুঝতে পারছিলাম না। তার আগেই হরেন ঠাকুর বলল, আজ আসি। পিছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। মনে হল ওর এই হাঁটার মধ্যে কোথায় যেন প্রসন্নতা আছে। কৌতুকে পল্লবীকে বললাম, নাও, পর এবার তোমার গজমোতির হার।
পল্লবী কিন্তু হাসল না। আমাকে বিস্মিত করে সেই হারটি মাথা গলিয়ে গলায় পরে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,--
দেখ, খারাপ লাগছে?
পল্লবী যা পরে বোধ হয় তাই মানায়। বাধ্য হলাম বলতে, না সুন্দর লাগছে মানতেই হবে। তবে বন্ধুদের কাছে যখন বলব গজমোতির হারের বদলে আকন্দ ফুলের মালা পরেছ তখন তারা হাসবে।
পল্লবী আমার কথায় একটু ম্লান হল।
ডাঃ সন্দীপের চেম্বারে রাত্রের দিকে মাঝে মধ্যে আড্ডা বসে।
পল্লবীর সঙ্গে ডাঃ নন্দীর স্ত্রীর পূর্বে পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।
তখন পেশেন্টের ভিড় শেষ। নিজেদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছিল--নারী ও পুষের মধ্যে কে বেশী জেগে থাকে। আমরা চারজন ছিলাম। দেখা গেল একজনের সাথে অন্যজনের ধারণা মিলছে না। যে যার নিজের স্ত্রী কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে

সেই হিসাবে বিচার শু করেছিল।
এই সময় হরেন ঠাকুর এসে হাজির।
ডাক্তার মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেল। আমরা যে যার মত গাম্ভীর্য দেখিয়ে ওকে এড়াতে চাইছিলাম।
সেই একই পোষাক মুখে বিনয়ের হাসি। বলল, ডাক্তারবাবু আমার হার্টটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন তো, কিরকম জোর আছে?
ডাঃ নন্দী কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।
হরেন ঠাকুর বলল, লোকে বলছে হার্টটা একবার চেক্ করিয়ে নিতে। একসাথে অত টাকা পাব তো । বিশাল সম্পত্তি। হার্ট কমজোর হলে যদি হার্টফেল হয়ে যায়।
ডাক্তার বলল, না, না তোমার হার্ট খুব ভালো আছে। এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বাড়ী যাও। হরেনের ঠিক ইচ্ছা ছিল না। ওকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার উদ্যোগ আমি নিলাম। বললাম, ওসব কথায় কান দেবেন না। আপনি তো প্রকৃত রাজা। যারা নকলরাজা হয় তাদের এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়। বুক ধুক্পুক্ করে। নিজের জিনিষ ফিরে পেলে কারও হার্ট ফেল হয়?
সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল হরেন রাজার, আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন ম্যানেজার বাবু। এসব জিনিষ শুধু আপনি বুঝবেন। সাধারণ লোক কি বুঝবে। বলুন। আচ্ছা আসি, বলে চলে যেতে যেতে আবার থামল হরেন ঠাকুর। আমাদের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।
কিছু মনে করবেন না আমি শুনছিলাম আপনারা কথা বলছিলেন কারা বেশি ঘুমোয় ছেলেরা না মেয়েরা? তাই তো?
আমরা এই ব্যাপারে ওর সাথে আলোচনা চালাতে মোটেই উৎসাহী ছিলাম না। কিছু উত্তর দিলাম না।
হরেন ঠাকুর বলল, বুঝলেন ডাক্তারবাবু ছেলে মেয়ে বলে কোন কথা নেই।
যারা স্বপ্ন দেখে না তারা বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। যারা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে তাদের চোখে ঘুম কম।
ঘুমই আসে না।
হরেন ঠাকুর কথা শেষ করে প্রসন্ন ভঙ্গিতে চলে গেল।
আমরা হাসতে গিয়েও থেমে গেলাম।
ডাক্তার শুধু বলল, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় হরেন রাজা কি সত্যি পাগল?

মানবিক বিকাশ ও ব্যাঙ্কের ভূমিকা নিয়ে জরী সেমিনার ছিল টাউন হলে। পেপার তৈরী করে শেষ মুহুর্তে চোখ বুলিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি।
হরেন অফিসে এসে হাজির।
সেই অবস্থায় ক্ষ গলায় বলেছিলাম, কি চাই?
সরলকণ্ঠে হরেন রাজা জানতে চাইল, -- আপনার দিল্লীর কোন ঠিকানা জানা আছে? কয়েকটা দিন যেখানে থাকতে পারব।
কি করবেন ওখানে গিয়ে? ব্যস্ততার মধ্যেও না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।
ভাবছি রাজত্ব যখন ফিরে পাব আমার রাজধানী একেবারে দিল্লীর মত সাজিয়ে তুলব। তাই একবার দেখে আসা দরকার দিল্লী শহরটা কেমন?
দীর্ঘ্শাস ফেলে ব্রিফকেস্ হাতে আমি উঠে দাঁড়াই। হরেন আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। বাধ্য হয়ে ওর মন রাখা কথা বললাম, আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। দিল্লি ঘুরে আসুন। হরেন ঠাকুর গলে গেল। দেখুন স্যার আপনার সাথে আমার কত মিল। আপনি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারেন। পারবেনই তো আপনার মধ্যেও সেই এক লক্ষণ।
একটু না থেমে জিজ্ঞেস করে, আপনি স্বপ্ন দেখেন স্যার।
আমার মধ্যেও কি পাগলের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছে হরেন ঠাকুর। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে বললাম, চল দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হরেন ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি, আপনার মত কোনদিন দিনে স্বপ্ন দেখি না। যান। গলার স্বরে ঢ়তা ফুটে উঠেছিল।
হরেন ঠাকুর গাড়ির জানালার কাঁচ ধরে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকায়। তারপর বলে, আপনিও মুকুট নামিয়ে রেখেছেন স্যার?
কথার অর্থ কিছু বুঝলাম না। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দেখলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হরেন ঠাকুর মিটি মিটি হাসছে।
এর মধ্যে হরেন ঠাকুর বেশ কয়েকবার বাড়িতে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে গেছে। প্রতিবারই পল্লবীকে বলে যায় সে যখন রাজত্ব ফিরে পাবে তখন ওর জন্যে সোনার মুকুট এনে দেবে। যে মুকুট মহারাণিরা পরে। পল্লবী ওকে চা খাওয়ার কথা বলেছিল,হরেন ঠাকুর কিন্তু চা খায়নি। শেষ পর্যন্ত পল্লবী যখন জানতে চেয়েছে কি দরকার আমার সঙ্গে তখন হরেন ঠাকুর প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত খুব কুণ্ঠার সাথে জানিয়েছে ম্যানেজারবাবুকে খুব জরি একটা কথা জানান দরকার।
কি কথা আমাকে বলা যায় না-- পল্লবী বোধ হয় একটু অভিমান নিয়ে বলেছিল। বিব্রত হরেন ঠাকুর আমতা-আমতা করে জানিয়েছিল, একটা লক্ষণের কথা বলার ছিল। পল্লবীর কাছে এটুকু শুনে আমি কোনভাবেই তার অর্থ খুঁজে পেলাম না। মনে হয়েছিল নিশ্চয় কোন সুযোগ-সুবিধার কথা হবে যেটা আমার কাছে থেকে ওর নেওয়া সম্ভব।
এরপর হরেন ঠাকুর সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেওয়া শু করলাম।
জেনেছিলাম, হরেন ঠাকুর রাজবংশের কেউ ছিল না। আগে তাঁত বালুচরী শাড়ি বুনতো তার সাথে বই পড়ার দাণ নেশা। নানাধরণের বই পড়ত। তারপর তাঁত বুনতে-বুনতে তাঁতঘরের অন্ধকার গর্তে বসে সে কখন স্বপ্ন বুনতে শু করেছিল কেউ জানে না। সেই থেকে এই রকম। সব সময় এক কল্পনার জগতে রয়েছে। হরেন ঠাকুর নিজেকে ভাবে এই শহরের রাজত্ব হারানো প্রাচীন রাজা। কল্পিত মামলায় সে একদিন সব ফিরে পাবে। বাস্তবে অভাবী মানুষ। তাঁতের সামান্য কাজকর্ম করে এখন কোনভাবে দিন কাটে। তবু স্বপ্ন দেখে আর ছায়ার সাথে লড়াই করে।
সেদিন পাড়ার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলের বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান সেরে বেরিয়ে আসছি। সঙ্গে পল্লবী ও আমার ছেলে সন্তু রয়েছে।
গেটের বাইরে অনেক অনাহূত লোকের ভিড়ে দেখি হরেন ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আশর্চ্য! নির্লজ্জের মত হরেন ঠাকুর এগিয়ে এসে বলল, নমস্কার ম্যানেজারবাবু। এরা কেমন খাওয়াল?
ভিড়ের মধ্যে ওর সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল লাগছিল না। পরনে সেই ময়লা পোষাক.....নিশ্চয় ফাঁকতালে ঢুকে একটু খাওয়ার চেষ্টায় আছে। আমি ওর কথার উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শু করেছি,
হরেন ঠাকুর আমার কাছে এসে বলল, -- এটা রাখুন স্যার।
দেখি পাতলা কাগজে মোড়া একটা টাকার মত।
নিতে আপত্তি করলে হয়তো সকলের সামনে জোর করবে, দেরি হবে। বিরত্ত মুখে বললাম, দাও।
ওটা নিয়ে কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি রাখলাম।
হরেন ঠাকুর বলল, এটা ম্যানেজারবাবু আপনার সম্মানের নজরানা।
আমি ক্ষুব্ধ হলাম। তার মানে ঘুষ। কি ভেবেছেন আমাকে?
মাথা দুলিয়ে সে বলল, না, নজরানা কি ঘুষ নাকি? আপনাকে ঘুষ দিতে যাব কেন আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?
মনে মনে বিস্মিত হলাম। পল্লবী একটু সামলে দেবার জন্যে বলে উঠল, আপনি দেরি করবেন না।
পরের ব্যাচের খাওয়া দাওয়া এখন শু হয়ে যাবে। --আপনি তাড়াতাড়ি যান।
হরেন উত্তর দিলে, না, আমি তো খেতে আসিনি। আমি এসেছিলাম আপনাদের জন্যে। তবে সেই ফাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছিলাম কেমন কি করেছে....।
একটু থেমে বলে, আমাকেও তো অনেক বড় ধরনের আয়োজন করতে হবে।
তার জন্যই এইসব দেখাশোনা। স্বপ্ন ভাসা গলায় ধীরে ধীরে হরেন রাজা বলতে শু করল, সে এক দাণ ব্যাপার হবে। আপনারা যেখানেই থাকুন কষ্ট করে আসবেন। আমার রাজ্য অভিষেক হবে।

আপনার জন্যে আলাদা সম্মান--রাজসম্মান। আমি বর্ধমান থেকে হাতি আনাব। কলকাতা থেকে আসবে ' গোরা ব্যান্ড'। আপনার জন্যে হাতি পাঠিয়ে দেব।
আলো অন্ধকারে হরেন রাজার গলায় নদীর ধারের উদাস হাওয়া।
আপনি আলাদা মানুষ। একটা কথা কতদিন বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি তাই আজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কাল দিল্লী যাব। সব দেখে শুনে আসি।
আমার লালকেল্লা হবে টেরাকোটা দিয়ে সাজান। সব ভেবে চিন্তে রেখেছি।
কতক্ষণে আমরা ওর হাত থেকে মুক্তি পাব সেই চিন্তা করছি। রাত্রের দিকে নির্জন পথ। আমাদের বাড়ি সামান্য দূরে, হেঁটে ফিরছিলাম। হরেন কিন্তু সঙ্গ ছাড়ছে না। পথে আসতে আসতে বলল, এটি নিশ্চয় আপনার ছেলে। সন্তুর দিকে হাত তুলে দেখাল। বার বছরের সন্তু পল্লবীর পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোর নিচে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেই উজ্জ্বল আলোতে যেন আরোও ভালো করে সন্তুর একটু কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ কি সুন্দর চেহারা। একেবারে রাজপুত্র।
এই স্তুতি কিসের জন্য বোঝার দরকার ছিল না। তার আগে নিজে থেকেই বলল, --হবেই না বা কেন? আপনার ছেলে তো!
একথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি পল্লবীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।
খানিকটা হো-হো করে নিজের মনে হেসে নিল হরেন ঠাকুর। তারপর রহস্য মাখা গলায় বলল, কাল দিল্লী চলে যাচ্ছ তবে তার আগে জানিয়ে দিয়ে যাই--এই কথাটি আগেও আপনাকে বলার জন্যে চেষ্টা করেছি বলা হয়ে ওঠেনি।
আমি এবার বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালাম।
হরেন ঠাকুর যেন গুপ্তধনের ঠিকানা দিচ্ছে এমনি সতর্ক দৃষ্টিতে চাপা গলায় জানাল আমি প্রথম দিনই লক্ষ্য করেছিলাম আপনার কপালে দুই ভুর মধ্যে রয়েছে পূর্ণকালো তিল। ওটি সৌভাগ্য তিলক--রাজলক্ষণ।
বুঝলাম আজ পূর্ণিমা হয়তো হরেন ঠাকুরের আবেগ তাই বেশি। এরপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, অগ্রিম রাজসম্মান দিয়ে রাখলাম। আপনার কপালে সৌভাগ্য তিলক। দেখবেন আপনি একদিন রাজা হবেন। শুধু যেন এই কটি কথা বলার জন্যই হরেন রাজা এসেছিল। কথার শেষে প্রসন্ন চিত্তে সে হেঁটে গেল উল্টো দিকে।
বাড়ি ফিরে এসে অবাক হয়েছিলাম দেখি কোটের পকেটে পাতলা কাগজে মোড়া একটি চক্‌চকে রূপোর টাকা। মানুষটি সত্যি পাগল।
ভেবেছিলাম পরে কোনদিন টাকাটি ফেরৎ দেব।

অফিসের কাজের চাপে হরেন ঠাকুরের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। মাস খানেক পরে একদিন অফিসে শুভেন্দু সেন বলল, স্যার, আপনার হরেন রাজা না কি হারিয়ে গেছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। বাড়িতে বলে গেছে ও নাকি দিল্লী যাচ্ছে। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। মনে পড়ে যায় সেই রাত্রির কথা। বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ওর কথায় আলাদা কোন গুত্ব দিইনি।
বাড়ি ফিরে পল্লবীকে শুভেন্দুর কথা বললাম। সব শুনে পল্লবী বিষণ্ণ হয়ে উঠল।
হরেন রাজার সম্পর্কে নানা পুরনো কথা হয়েছিল নিজেদের মধ্যে-- কোন মানুষ হারিয়ে গেলে যে ভাবে তার কথা মনে আসে।
একসময় সন্তু বলে, বাবা, ওইদিন রাত্রে রাজা তোমাকে কি বলেছিল ফিস্‌ফিস্ করে?
ও কিছু নয়... হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম সন্তুর কথা।
সময়ও উড়ে চলে। দিনকাল বদলে যায় খুব দ্রুত।
ব্যাঙ্কের চাকরিতে সেই সুদিন আর নেই। ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চলে গেছে বেশ কয়েকজন।
কিছু পরোক্ষ চাপ আসছে সকলের ওপরই। অথচ এই সময় প্রমোশন ডিউ। ভেবেছিলাম প্রমোশন হলে এই মফস্বল থেকে কমপক্ষে আসানসোল বা দূর্গাপুর ব্রাঞ্চে চলে যাবার চেষ্টা করব।

কিন্তু মনে উদ্বেগ বাড়ে প্রমোশনের বদলে যদি স্বেচ্ছা অবসর নিতে হয়।
তবে সেটা বড় লজ্জাজনক হবে। এখনও দশ বছর চাকরি রয়েছে। আর্থিক ক্ষতি কিছু হবে না। তবে হঠাৎ চাকরি না থাক
ার যে শূন্যতা তা বেশি হাহাকার তুলে বুকে বাজবে। চাকরিহীন দিন যাপনের মধ্যে কোথায় যেন এক অসম্মানের ছায়া।
রাত্রে ভাবনা আসে। পাতলা ঘুমের মধ্যে এক একদিন গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের হয়।
পল্লবী আমাকে ডেকে তুলে ভয় পাওয়া চোখে বলে, কি হয়েছে তোমার, স্বপ্ন দেখছিলে? ইশ্ তোমার কপালে কত ঘাম।
যত্ন করে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় দুঃস্বপ্নের নোনা জল। চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।
শিশুকে আদর করার মত আমার কপালে ওর নরম ঠোঁটের ছোঁয়া রাখে। আমাকে শান্ত করতে চায়। আমি সাময়িকভ
াবে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু উদ্বেগের ছায়া যে বুকে রয়ে গেছে তা সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার পর টের পাই।
এমনি বিষণ্ণ সকাল মাঝে-মাঝে আসে।
সেইভাবেই একদিন বাথমের বেসিনের সামনে চোখে মুখে জল দিয়ে ঠান্ডা করতে চাই নিজেকে।
হৃৎপিন্ডের অশান্ত চলাচল ছন্দে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। কিন্তু বার বার এক অশুভ ছায়া দুলে ওঠে।
আরও ঝুঁকে বেসিনের আয়নায় নিজের মুখখানা ভালো করে দেখতে চাই।
আমার চোখে কি কালি পড়েছে, দুশ্চিন্তার ছাপ?
তখনই হঠাৎ চোখে পড়ে।
পলকে মনে আসে হরেন রাজার কথা।
দুই ভুর মাঝখানে ছোট কালো বিন্দু। হরেন রাজা বলেছিল,--'রাজলক্ষণ'।
এই সামান্য তিল্‌টি আগে সেভাবে লক্ষ্য করিনি। আজ বারবার দেখি। দুই ভুর মাঝখানে চোখ রেখে বুকে ঢেউ ওঠে।
সৌভাগ্য তিলক!
এক সময় বুঝতে পারি আশ্বিন মাসের ভোরে শিউলি ফুলে যেমন এক উৎসবের গন্ধ লুকিয়ে থাকে সেই রকম কোন নির্ভয়
ঠিকানা যেন আমার হাতের মুঠোয়।
পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজে নিশ্চিন্তে নিজের মধ্যে ডুবে যাই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com